মানসিক প্রশান্তির খোজে

~ সেনেকা

নিশ্চয়ই, সেরেনুস[1], অনেক দিন ধরেই আমি নীরবে নিজেকে জিজ্ঞেস করে আসছি— তোমার এই মানসিক অবস্থাটিকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর সবচেয়ে নিকটবর্তী তুলনা আমি পেয়েছি তাদের অবস্থার সঙ্গে, যারা দীর্ঘ ও গুরুতর অসুস্থতা থেকে সেরে উঠেছে, কিন্তু এখনো মাঝেমধ্যে হালকা জ্বর বা ব্যথার আক্রমণে আক্রান্ত হয়; এবং শেষ লক্ষণগুলো চলে যাওয়ার পরও তারা অকারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। পুরোপুরি সুস্থ হয়েও তারা চিকিৎসকের কাছে হাত বাড়ায় এবং সামান্য উষ্ণতা অনুভব করলেই অযথা অভিযোগ করে।

এই মানুষদের ক্ষেত্রে, সেরেনুস, সমস্যাটা এই নয় যে তাদের দেহ পুরোপুরি আরোগ্যলাভ করেনি; বরং তারা এখনো সুস্থতার সঙ্গে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন, একটি শান্ত সমুদ্রও মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঢেউ দেখায়—বিশেষ করে যখন তা কোনো ঝড়ের পর শান্ত হয়েছে।

সুতরাং, তোমার এখন আর সেই কঠোর ও প্রাথমিক চিকিৎসাগুলোর প্রয়োজন নেই—যেগুলো আমরা ইতিমধ্যেই শেষ করেছি: কোথাও নিজেকে আটকে রাখা, কোথাও নিজের ওপর রাগ করা, কোথাও কঠোরভাবে নিজেকে হুমকি দেওয়া। এখন দরকার চূড়ান্ত চিকিৎসা—নিজের প্রতি আস্থা, এবং এই বিশ্বাস যে তুমি সঠিক পথেই আছো, এবং সেইসব অসংখ্য পথের দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছো না যেগুলো তোমার পথকে অতিক্রম করে যায়—যাদের মধ্যে অনেকেই সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট, যদিও কেউ কেউ সত্যপথের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে।

তুমি যে জিনিসটির জন্য আকাঙ্ক্ষা করছো, তা মহান, সর্বোচ্চ এবং প্রায় দেবত্বের নিকটবর্তী—অচঞ্চল থাকা। গ্রিকরা এই দৃঢ় মানসিক অবস্থাকে ‘euthymia’ বলে (ডেমোক্রিটাস এ বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন), কিন্তু আমি একে বলি ‘প্রশান্তি’। গ্রিক শব্দের আকার নকল করার প্রয়োজন নেই; বরং এমন একটি শব্দ ব্যবহার করা উচিত যা তার অর্থ বহন করে, রূপ নয়।

অতএব, আমরা খুঁজছি—কীভাবে মন একটি মসৃণ ও স্থির গতিতে চলতে পারে, নিজের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে, নিজের অবস্থাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে, এবং এই আনন্দে কোনো বিঘ্ন না ঘটিয়ে, শান্ত অবস্থায় স্থির থাকতে পারে—উত্থান-পতনহীন। সেটাই প্রকৃত প্রশান্তি।

চল আমরা সাধারণভাবে বিবেচনা করি কীভাবে এটি অর্জন করা যায়। এরপর তুমি এই সামষ্টিক চিকিৎসা থেকে নিজের প্রয়োজনমতো গ্রহণ করতে পারবে। এরই মধ্যে, আমাদের এই সমগ্র দুর্বলতাটিকে প্রকাশ্যে আনতে হবে—যাতে প্রত্যেকে এতে নিজের অংশটি চিনতে পারে। তখন তুমি উপলব্ধি করবে, নিজের প্রতি বিরক্তি নিয়ে তোমার সমস্যা অন্যদের তুলনায় কত কম—যারা ভানপূর্ণ ঘোষণায় আবদ্ধ, গৌরবময় উপাধির বোঝা বহন করছে, এবং ইচ্ছার চেয়ে লজ্জার কারণে নিজেদের ভণ্ডামির সঙ্গে আটকে আছে।

তারা সবাই একই শ্রেণির—যারা চঞ্চলতা, একঘেয়েমি এবং উদ্দেশ্যের নিরন্তর পরিবর্তনে ভোগে; যারা সবসময় যা ফেলে এসেছে তার জন্য আকুল হয়; এবং যারা নিছক উদাসীনতায় হাই তোলে। আবার কেউ আছে, যারা অনিদ্রারোগীর মতো এপাশ-ওপাশ করে, অবস্থান বদলাতে থাকে যতক্ষণ না ক্লান্তির ফলে

[1] সেনেকার এক বন্ধু

বিশ্রাম পায়। তারা জীবনের অবস্থা বারবার বদলায়, এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থায় স্থির হয় যেখানে তারা পরিবর্তনের ক্লান্তিতে নয়, বরং বার্ধক্যের জড়তায় আটকে পড়ে।

আবার কেউ আছে যারা নৈতিক দৃঢ়তার অভাবে নয়, বরং জড়তার কারণে স্থির—তারা নিজের ইচ্ছামতো বাঁচার মতো চঞ্চলতাও রাখে না, বরং যেভাবে শুরু করেছে সেভাবেই বেঁচে থাকে।

এই রোগের লক্ষণ অসংখ্য, কিন্তু এর একটিই মূল ফল—নিজের প্রতি অসন্তোষ। এটি জন্ম নেয় মানসিক অস্থিরতা এবং ভীত, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা থেকে। মানুষ হয় সাহস করে না, নয়তো সফল হয় না যা তারা চায় তা অর্জনে; ফলে তারা কেবল আশার ওপর ভর করে থাকে—সর্বদা অস্থির ও চঞ্চল, যা অনিবার্যভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাসের ফল।

তারা তাদের কামনা পূরণের জন্য সব পথেই চেষ্টা করে, এবং নিজেদের বাধ্য করে অসম্মানজনক ও কঠিন কাজ করতে। কিন্তু যখন তাদের প্রচেষ্টা ফল দেয় না, তখন সেই ব্যর্থ অপমান তাদের কষ্ট দেয়; তারা অনুশোচনা করে—পাপের জন্য নয়, বরং ব্যর্থতার জন্য।

এরপর তারা তাদের প্রচেষ্টার জন্য অনুতপ্ত হয়, আবার চেষ্টা করার ভয় পায়, এবং এমন এক অস্থির মন দ্বারা ভেঙে পড়ে যা কোনো পথ খুঁজে পায় না—কারণ তারা না তাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, না তাকে অনুসরণ করতে পারে। তাদের জীবন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সামনে পথ দেখতে পায় না; তাদের আত্মা জড়তায় নিমজ্জিত হয়, পরিত্যক্ত আশার মধ্যে স্থবির হয়ে থাকে।

এই সব কষ্ট আরও বেড়ে যায় যখন, নিজেদের ব্যর্থতার প্রতি ঘৃণা থেকে, তারা অলসতা ও ব্যক্তিগত অধ্যয়নে আশ্রয় নেয়—যা তাদের জন্য অসহনীয়, কারণ তাদের মন জনসেবায় আগ্রহী, কর্মে উৎসাহী, এবং স্বভাবতই অস্থির—কারণ তাদের ভেতরে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই।

ফলে, যখন কাজের মাধ্যমে যে আনন্দ তারা পেত তা কেড়ে নেওয়া হয়, তখন মন ঘর, নিঃসঙ্গতা, দেয়াল—এসব সহ্য করতে পারে না, এবং নিজের একাকীত্বকে ঘৃণা করে।

এ থেকেই জন্ম নেয় সেই একঘেয়েমি, নিজের প্রতি অসন্তোষ, অস্থির মনের অশান্তি, এবং অবসরের প্রতি বিষণ্ণ ও অনিচ্ছুক সহনশীলতা—বিশেষত যখন আমরা এর কারণ স্বীকার করতে লজ্জা পাই এবং সেই লজ্জা আমাদের যন্ত্রণা অন্তরের ভেতরেই বন্দী করে রাখে।

এ থেকেই জন্ম নেয় বিষণ্ণতা, শোক, এবং দ্বিধাগ্রস্ত মনের হাজারো দোলাচল—যা আশার জন্মে উল্লসিত হয়, আর তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এ থেকেই জন্ম নেয় সেই মানসিক অবস্থা, যেখানে মানুষ নিজের অবসরকে ঘৃণা করে এবং অভিযোগ করে যে তার কিছুই করার নেই; এবং অন্যদের উন্নতিতে তীব্র ঈর্ষা অনুভব করে।

অকার্যকর অলসতা হিংসা জন্ম দেয়, এবং তারা নিজেরা সফল হতে না পারায় চায় অন্যরাও ধ্বংস হোক। এরপর অন্যদের সাফল্যের প্রতি বিরাগ এবং নিজের ব্যর্থতার হতাশা থেকে তাদের মন ভাগ্যের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, সময়কে দোষারোপ করে, অজ্ঞাতবাসে সরে যায়, এবং নিজের কষ্ট নিয়ে ভাবতে থাকে—যতক্ষণ না তারা নিজেদের কাছেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে ওঠে।

কারণ মানুষের মন স্বভাবতই গতিশীল এবং ক্রিয়াশীলতা পছন্দ করে। যে কোনো উদ্দীপনা বা বিচ্ছিন্নতার সুযোগ তাকে আকর্ষণ করে—বিশেষত সেইসব নিম্নমানের চরিত্রের মানুষদের, যারা ব্যস্ততায় ক্লান্ত হয়ে পড়তেও উপভোগ করে।

কিছু শারীরিক ক্ষত যেমন এমন হাতকে স্বাগত জানায় যা তাকে আঘাত করবে, এবং চুলকানি যেমন আঁচড়াতে ভালোবাসে—তেমনি যেসব মনে কামনা ভয়ঙ্কর ঘায়ের মতো ফেটে বেরিয়েছে, তারা পরিশ্রম ও কষ্টেই আনন্দ খুঁজে পায়।

কিছু জিনিস আমাদের শরীরকে আনন্দ দেয়, যদিও তা কিছুটা কষ্ট দেয়—যেমন, একই ভঙ্গিতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বারবার পাশ বদলানো। হোমারের বর্ণনায় অ্যাকিলিস কখনো উপুড় হয়ে, কখনো চিৎ হয়ে শুয়ে থাকত, নানা ভঙ্গিতে স্বস্তি খুঁজত—একজন অসুস্থ মানুষের মতো, যে কোনো অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, এবং নিজের অস্থিরতাকেই চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করে।

এই কারণেই মানুষ দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করে, বিদেশি তটে ঘোরে, স্থল ও সমুদ্রপথে নিজের অস্থিরতাকে পরীক্ষা করে—কারণ সে সর্বদা তার চারপাশের জিনিসকে ঘৃণা করে।

"চলো, এবার ক্যাম্পানিয়ায় যাই।"
তারপর বিলাসিতায় ক্লান্ত হয়ে—"চলো, অনাবাদী অঞ্চলে যাই; ব্রুট্টিয়াম ও লুকানিয়ার অরণ্য দেখি।"
কিন্তু সেই নির্জনতার মধ্যেও কিছু যেন অনুপস্থিত—যা তাদের অভ্যস্ত চোখকে আরাম দিতে পারে।
"চলো, তারেন্টামে যাই—তার বিখ্যাত বন্দর, মৃদু শীত, এবং প্রাচীনকাল থেকেই জনবহুল সমৃদ্ধ অঞ্চল।"
"এবার শহরে ফিরি"—তাদের কান অনেক দিন প্রশংসার শব্দ শোনেনি; এখন তারা এমনকি রক্তপাতের দৃশ্যও দেখতে চায়।

এভাবে তারা এক ভ্রমণ থেকে আরেক ভ্রমণে যায়, এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যে। যেমন লুক্রেতিয়াস বলেছেন—"এভাবেই মানুষ চিরকাল নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়।"

কিন্তু লাভ কী, যদি সে নিজের কাছ থেকেই পালাতে না পারে? সে নিজেকেই অনুসরণ করে, নিজেকেই তাড়া করে—নিজেরই সবচেয়ে বিরক্তিকর সঙ্গী হয়ে।

অতএব, আমাদের বুঝতে হবে—সমস্যাটি স্থান বা পরিবেশের নয়; বরং আমাদের নিজেদের মধ্যেই এর মূল নিহিত। আমরা যেকোনো কিছু সহ্য করতে দুর্বল—পরিশ্রম, আনন্দ, নিজেদের সঙ্গ, কিংবা অন্য কোনো কিছুকেই দীর্ঘক্ষণ সহ্য করতে পারি না। এই দুর্বলতাই কিছু মানুষকে মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দিয়েছে; কারণ তারা বারবার লক্ষ্য পরিবর্তন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একই জায়গায় ফিরে এসেছে, ফলে নতুন কিছুর জন্য নিজেদের কোনো অবকাশই রাখেনি। তারা জীবন এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রতিই বিরক্ত হয়ে উঠেছে, এবং নিজের ভোগবিলাসে অবসন্ন হয়ে তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে—"কতদিন আমাকে একই জিনিসের মুখোমুখি হতে হবে?"

তুমি জানতে চাও, এই একঘেয়েমির বিরুদ্ধে আমি কী প্রতিকার সুপারিশ করতে পারি। অ্যাথেনোদোরাসের মতে, সর্বোত্তম পথ হলো নিজেকে ব্যবহারিক কাজে নিয়োজিত করা—রাজনীতি ও নাগরিক কর্তব্যে অংশ নেওয়া। যেমন কেউ কেউ দিন কাটায় রৌদ্রে বসে, ব্যায়াম করে এবং দেহের যত্ন নিয়ে; এবং ক্রীড়াবিদদের জন্য তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি বাড়ানোর জন্য অধিকাংশ সময় ব্যয় করা অত্যন্ত জরুরি—কারণ সেটাই তাদের একমাত্র সাধনা; তেমনি তুমি, যে

জনজীবনের প্রতিযোগিতার জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করছো, তোমার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হলো নিয়মিত অনুশীলন।

কারণ, যখন কেউ নিজের সহনাগরিক ও সমগ্র মানবসমাজের উপকারে আসার উদ্দেশ্যে কাজ করে, তখন সে একই সঙ্গে অনুশীলনও করছে এবং কল্যাণও সাধন করছে—যদি সে সম্পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে।

কিন্তু, অ্যাথেনোদোরাস বলেন, "মানুষ এতটাই উন্মত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আক্রান্ত, এবং এত মিথ্যা অভিযোগকারী আছে যারা সত্যকে বিকৃত করে মিথ্যায় পরিণত করে—ফলে সততা অনিরাপদ হয়ে পড়ে এবং সাহায্যের চেয়ে বাধার সম্মুখীন হয়—এই কারণে আমাদের জনজীবন ও রাজনীতি থেকে সরে আসা উচিত। যদিও একটি মহান মন ব্যক্তিগত জীবনেও স্বাধীনভাবে সক্রিয় থাকার যথেষ্ট ক্ষেত্র পায়।

সিংহ বা অন্যান্য প্রাণীর শক্তি খাঁচায় সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু মানুষের নয়; মানুষের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব অনেক সময় নিভৃত জীবনেই প্রকাশ পায়। তবে, কেউ যদি নিজেকে গুটিয়ে নেয়, তাহলে শর্ত এই—সে যেখানেই নিজের অবসরকে লুকিয়ে রাখুক না কেন, সে যেন তার বুদ্ধি, বাক্য এবং পরামর্শের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমগ্র মানবজাতির সেবা করতে প্রস্তুত থাকে।

রাষ্ট্রের সেবা শুধু তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যারা পদপ্রার্থীদের সমর্থন করে, আদালতে মামলা লড়ে, কিংবা যুদ্ধ ও শান্তির পক্ষে ভোট দেয়। যে তরুণদের শিক্ষা দেয়, তাদের মনে গুণাবলি সঞ্চার করে (যেখানে আমাদের ভালো শিক্ষকের ভীষণ অভাব), যে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে যারা সম্পদ ও বিলাসিতার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটছে—অন্তত তাদের কিছুটা হলেও থামিয়ে দেয়—সেও জনসেবাই করছে, যদিও সে ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থান করছে।

তুমি কি মনে করো, বিচারকরা যারা বিদেশি ও নাগরিকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করে, তাদের চেয়ে বেশি উপকার করে না তারা—যারা ন্যায়, ধর্মপরায়ণতা, সহনশীলতা, সাহস, মৃত্যুভয় অতিক্রম, দেবতাদের জ্ঞান, এবং সুস্থ বিবেকের স্বাধীনতার মূল্য শেখায়?

অতএব, তুমি যদি জনজীবনের কর্তব্য থেকে সময় সরিয়ে পড়াশোনায় ব্যয় করো, তাহলে তুমি তোমার কর্তব্য থেকে পালিয়ে যাচ্ছো না, বরং তা পূরণই করছো।

কারণ সৈনিক শুধু সে-ই নয়, যে যুদ্ধক্ষেত্রে ডান-বাম দিক রক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে; সে-ও সৈনিক, যে দরজা পাহারা দেয়, অস্ত্রাগার রক্ষা করে, কিংবা প্রহরীর দায়িত্ব পালন করে—যদিও এসব কাজ রক্তপাতহীন, তবুও তা সামরিক সেবার অন্তর্ভুক্ত।

তুমি যদি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করো, তাহলে জীবনের প্রতি একঘেয়েমি দূর হবে; তুমি দিনের প্রতি বিরক্ত হয়ে রাতের অপেক্ষায় থাকবে না; তুমি নিজের কাছে বোঝা হয়ে উঠবে না, অন্যদের কাছেও অপ্রয়োজনীয় হবে না; বরং তুমি অনেককে আকর্ষণ করবে, এবং শ্রেষ্ঠ মানুষরা তোমার চারপাশে সমবেত হবে।

কারণ প্রকৃত গুণ কখনো আড়ালে থাকে না; তা নিজেই নিজের পরিচয় দেয়—যে এর যোগ্য, সে এর পথ অনুসরণ করবেই।

কিন্তু যদি আমরা সমস্ত সমাজ থেকে সরে যাই এবং মানবজাতিকে ত্যাগ করে শুধু নিজের জন্য বাঁচি, তাহলে এই আগ্রহহীন নিঃসঙ্গতা দ্রুতই অর্থপূর্ণ কাজের অভাবে পরিণত হবে। তখন আমরা কখনো বাড়ি বানাবো, কখনো ভেঙে ফেলবো; সমুদ্র ঠেলে সরানোর চেষ্টা করবো; প্রকৃতির নিয়ম ভেঙে জলপ্রবাহ সৃষ্টি করবো—এবং প্রকৃতি আমাদের যে সময় দিয়েছে তা অপচয় করবো।

আমাদের মধ্যে কেউ সময় সংযমের সঙ্গে ব্যবহার করে, কেউ অপচয় করে; কেউ এমনভাবে ব্যয় করে যে তার হিসাব দিতে পারে, আবার কেউ এমনভাবে যে শেষে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—যা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

অনেক সময় এমনও দেখা যায়, এক বৃদ্ধ মানুষের দীর্ঘ জীবনের একমাত্র প্রমাণ তার বয়স ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমার মনে হয়, প্রিয় সেরেনুস, অ্যাথেনোদোরাস সময়ের কাছে খুব সহজেই নতি স্বীকার করেছেন এবং খুব দ্রুত সরে গেছেন। আমি অস্বীকার করি না যে কখনো কখনো ছাড় দিতে হয়—কিন্তু তা হওয়া উচিত ধীরে ধীরে, নিজের অবস্থান ও সম্মান বজায় রেখে।

যারা শত্রুর সঙ্গে সমঝোতা করার সময়ও অস্ত্র হাতে রাখে, তারা অধিক নিরাপদ এবং সম্মানিত। আমার মতে, গুণ এবং গুণের অনুগামীদেরও তেমনই করা উচিত। যদি ভাগ্য কারও ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তাকে কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, তবে সে যেন সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন না করে—অস্ত্র ফেলে পালিয়ে না যায়, যেন এমন কোনো জায়গা খোঁজে না যেখানে ভাগ্য তাকে খুঁজে পাবে না (কারণ এমন কোনো জায়গা নেই)।

বরং সে যেন সীমিত পরিসরে হলেও তার কর্তব্য পালন করে এবং সতর্কভাবে এমন কোনো ক্ষেত্র বেছে নেয় যেখানে সে রাষ্ট্রের সেবা করতে পারে।

ধরা যাক, সে সৈনিক হতে পারে না—তাহলে সে জনপদের কোনো পদ গ্রহণ করুক। যদি তাকে ব্যক্তিগত জীবনে থাকতে হয়—তাহলে সে আইনজীবী হোক। যদি তাকে নীরব থাকতে বাধ্য করা হয়—তাহলে সে নীরব সমর্থনের মাধ্যমে সহনাগরিকদের সাহায্য করুক।

যদি প্রকাশ্যে উপস্থিত হওয়া বিপজ্জনক হয়—তাহলে ব্যক্তিগত পরিসরে, আসরে, ভোজসভায় সে একজন ভালো সঙ্গী, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সংযত ভোজনকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করুক।

যদি সে নাগরিকের কর্তব্য হারায়—তাহলে সে মানুষের কর্তব্য পালন করুক।

আমরা উচ্চমনা হয়ে নিজেদের একটি শহরের প্রাচীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিনি; বরং সমগ্র পৃথিবীকেই আমাদের দেশ বলে দাবি করেছি—যাতে আমাদের গুণের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

ধরা যাক, তোমাকে বিচারালয়, বক্তৃতা, নির্বাচন—সবকিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে; তবুও তোমার সামনে অসংখ্য অঞ্চল উন্মুক্ত রয়েছে। তুমি কখনো এমন কোনো ক্ষেত্র পাবে না, যা পুরোপুরি বন্ধ, যেখানে তার চেয়ে বৃহত্তর কোনো ক্ষেত্র খোলা নেই।

তবে খেয়াল রাখবে—এটা যেন পুরোপুরি তোমার নিজের দোষ না হয়। যেমন, তুমি যদি কেবল কনসাল বা প্রাইটানিস হওয়ার জন্যই জনপদে প্রবেশ করতে চাও, কিংবা শুধু সেনাপতি বা ট্রিবিউন না হলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে না চাও—তাহলে সেটি তোমার সীমাবদ্ধতা।

যদি অন্যরা প্রথম সারিতে থাকে এবং তোমার স্থান তৃতীয় সারিতে নির্ধারিত হয়, তবুও তোমাকে সেখানে সৈনিকের মতো কাজ করতে হবে—কণ্ঠ, উৎসাহ, উদাহরণ এবং সাহস দিয়ে।

যদি কারও হাত কেটে ফেলা হয়, তবুও সে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এবং অন্যদের উৎসাহ দিয়ে নিজের পক্ষের সেবা করতে পারে।

তোমারও তেমন কিছু করা উচিত: যদি ভাগ্য তোমাকে জনজীবনের শীর্ষ ভূমিকা থেকে সরিয়ে দেয়, তবুও তুমি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে অন্যদের উৎসাহ দাও; কেউ যদি তোমার কণ্ঠরোধ করে, তবুও তুমি নীরবে সাহায্য করে যাও।

একজন সৎ নাগরিকের সেবা কখনোই নিরর্থক নয়—তার উপস্থিতি, তার চেহারা, তার মাথা নাড়ানো, এমনকি তার নীরবতাও অন্যদের সাহায্য করে।

যেমন কিছু উপকারী বস্তু আমাদের স্বাদ বা স্পর্শ ছাড়াই কেবল গন্ধের মাধ্যমে উপকার করে, তেমনি গুণও দূর থেকে, আড়ালে থেকেও তার প্রভাব বিস্তার করে।

তোমাকে বিবেচনা করতে হবে—তোমার স্বভাব কি কার্যকর কর্মজীবনের জন্য বেশি উপযুক্ত, নাকি শান্ত অধ্যয়ন ও মননশীল চিন্তার জন্য; এবং তোমার সহজাত ক্ষমতা ও প্রবণতা যেদিকে নির্দেশ করে, সেদিকেই ঝুঁকতে হবে।

আইসোক্রেটিস জোর করে এফোরাসকে জনসমাগমের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন—ইতিহাস রচনাতেই তার দক্ষতা বেশি উপযোগী হবে। জন্মগত প্রবণতা জোরজবরদস্তিতে সাড়া দেয় না; প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে আমরা বৃথাই শ্রম দিই।

কিন্তু কিছুই মনের জন্য তত আনন্দদায়ক নয়, যতটা আন্তরিক ও বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব। কত বড় আশীর্বাদ—এমন কিছু হৃদয় পাওয়া, যারা তোমার সমস্ত গোপনীয়তা নিরাপদে গ্রহণ করতে প্রস্তুত; যাদের সঙ্গে কিছু ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে তুমি নিজের কাছে গোপন রাখার চেয়েও কম ভয় পাও; যাদের আলাপ তোমার দুঃখ প্রশমিত করে, যাদের পরামর্শ তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, যাদের প্রফুল্লতা তোমার দুঃখ গলিয়ে দেয়, এবং যাদের উপস্থিতিই তোমাকে উজ্জীবিত করে!

অবশ্যই, আমরা এমন মানুষদেরই বেছে নেব, যারা যতদূর সম্ভব প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত; কারণ দোষত্রুটি নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ে, এবং যারা কাছে থাকে তারাই আগে তার সংস্পর্শে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অতএব, যেমন মহামারীর সময় আমরা জ্বরাক্রান্ত মানুষের পাশে বসতে সতর্ক থাকি—কারণ তাদের নিঃশ্বাসের মাধ্যমেও আমরা আক্রান্ত হতে পারি—তেমনি বন্ধুত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমরা এমন ব্যক্তিদেরই বেছে নিই, যারা সবচেয়ে কম কলুষিত। সুস্থের সঙ্গে অসুস্থের মিশ্রণ থেকেই রোগের সূচনা হয়।

তবে আমি তোমাকে এ কথা বলছি না যে, তুমি কেবল জ্ঞানীদের সঙ্গেই মেলামেশা করবে। কারণ, সেই মানুষটিকে তুমি কোথায় পাবে, যাকে আমরা যুগের পর যুগ ধরে খুঁজে আসছি? আদর্শের পরিবর্তে আমাদের অপেক্ষাকৃত কম খারাপকেই মেনে নিতে হয়।

তুমি যদি প্লেটো, জেনোফন এবং সক্রেটিসের ঐ বংশধরদের মধ্যে ভালো মানুষ খুঁজতে যাও, অথবা ক্যাটোর যুগে প্রবেশ করতে পারো—যে যুগে অনেক যোগ্য মানুষ জন্মেছিল—তাহলে হয়তো আরও ভালো নির্বাচন সম্ভব হতো। (যদিও সেই যুগেই সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষরাও ছিল, যারা ভয়াবহ অপরাধ করেছিল; কারণ উভয় শ্রেণির মানুষই ক্যাটোকে যথার্থভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজন ছিল—সৎ মানুষরা তার প্রশংসা করার জন্য, আর অসৎরা তার শক্তির প্রমাণ দেওয়ার জন্য।)

কিন্তু বর্তমান সময়ে, যেখানে ভালো মানুষের অভাব, সেখানে তোমাকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছুটা কম খুঁতখুঁতে হতে হবে।

তবুও বিশেষভাবে এড়িয়ে চলতে হবে তাদের, যারা সবসময় বিষণ্ন, সর্বদা অভিযোগ করে, এবং সামান্য উপলক্ষ পেলেই নালিশ শুরু করে। একজন মানুষের বিশ্বস্ততা ও সদ্ভাব নিয়ে সন্দেহ না থাকলেও, যে সঙ্গী সবকিছু নিয়ে অস্থির ও কাতর, সে মনের শান্তির জন্য এক প্রকার শত্রুই।

চল আমরা ব্যক্তিগত সম্পদের প্রসঙ্গে আসি—যা মানবজীবনের দুঃখের সবচেয়ে বড় উৎস। কারণ, যদি তুমি অন্যান্য সব কষ্ট—মৃত্যু, অসুখ, ভয়, আকাঙ্ক্ষা, যন্ত্রণা ও পরিশ্রমের সহনশীলতা—এসবের সঙ্গে অর্থ যে দুঃখ বয়ে আনে তা তুলনা করো, তবে দেখবে অর্থজনিত দুঃখই সবার চেয়ে বেশি।

অতএব আমাদের মনে রাখা উচিত—অর্থ না থাকার বেদনা, তা হারানোর বেদনার চেয়ে অনেক হালকা। তখন আমরা বুঝতে পারব, দারিদ্র্যের হারানোর মতো যত কম থাকে, তার যন্ত্রণা ততই কম। তুমি ভুল করছো যদি মনে করো ধনীরা বেশি ধৈর্যের সঙ্গে কষ্ট সহ্য করে; ক্ষতের বেদনা বড় দেহে যেমন, ছোট দেহেও তেমনি।

বিয়ন যথার্থই বলেছেন—টাক মাথার মানুষের চুল উপড়ে নেওয়ার বেদনাও ঠিক ততটাই, যতটা চুলওয়ালা মানুষের। একইভাবে বলা যায়, ধনী ও দরিদ্র উভয়েই সমানভাবে কষ্ট পায়; কারণ উভয়েই তাদের সম্পদের প্রতি আসক্ত, এবং তা হারালে ব্যথিত হয়।

তবে, যেমনটা আমি বলেছি, কোনো কিছু হারানোর চেয়ে তা অর্জন না করাটাই সহজ এবং তা সহ্য করাও সহজতর; তাই তুমি লক্ষ্য করবে, যাদের প্রতি ভাগ্য কখনো অনুকূল ছিল না, তারা প্রায়ই তাদের চেয়ে বেশি প্রফুল্ল, যাদেরকে ভাগ্য পরে ত্যাগ করেছে।

মহান আত্মার অধিকারী ডায়োজিনিস এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন, এবং এমনভাবে জীবনযাপন করেছিলেন যাতে তার কাছ থেকে কিছুই কেড়ে নেওয়া না যায়। তুমি চাইলে এই অবস্থাকে দারিদ্র্য, অভাব, প্রয়োজন—যেকোনো নামে ডাকতে পারো; কিন্তু আমি তাকে সুখী বলে মানতে অস্বীকার করব, যদি তুমি এমন আর কাউকে দেখাতে পারো যার হারানোর মতো কিছুই নেই।

যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তবে কৃপণ, প্রতারক, দস্যু এবং অপহরণকারী—এই সবার ভিড়ে এমন একমাত্র মানুষ হওয়া, যাকে কোনোভাবেই ক্ষতি করা সম্ভব নয়, সেটি সত্যিই এক রাজকীয় অবস্থান।

যদি কেউ ডায়োজিনিসের সুখ নিয়ে সন্দেহ করে, তবে সে অমর দেবতাদের অবস্থাকেও প্রশ্ন করতে পারে—তারা কি দুঃখী, কারণ তাদের কোনো সম্পত্তি, বাগান, বিলাসবহুল খামার বা সুদের আয় নেই?

হে সম্পদের মোহে আক্রান্ত মানুষ, তোমাদের কি লজ্জা হয় না? আকাশের দিকে তাকাও—তুমি দেখবে দেবতারা কিছুই নিজের করে রাখেন না, তবুও সবকিছু দান করেন।

যে মানুষ নিজেকে ভাগ্যের সব দান থেকে মুক্ত করেছে, তুমি কি তাকে দরিদ্র বলবে, নাকি তাকে অমর দেবতাদের মতো মনে করবে?

পম্পেয়ের মুক্তদাস ডেমেট্রিয়াস নিজেকে পম্পেয়ের চেয়েও ধনী মনে করতে লজ্জা পেত না; তুমি কি বলবে, সে এজন্য বেশি সুখী ছিল?

সে প্রতিদিন নিজের দাসদের সংখ্যা গুনত, যেন একজন সেনাপতি তার সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করছে; অথচ আগে সে ভাবত—দুইজন দাস আর একটি একটু বড় ঘরই যথেষ্ট সম্পদ।

অন্যদিকে, যখন ডায়োজিনিসকে বলা হলো তার একমাত্র দাস পালিয়ে গেছে, তিনি তা ফিরিয়ে আনার মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। তিনি বললেন, "এটা লজ্জার হবে, যদি মানেস ডায়োজিনিস ছাড়া থাকতে পারে, আর ডায়োজিনিস মানেস ছাড়া না পারে।"

আমার মনে হয়, তিনি বলতে চেয়েছিলেন—"ভাগ্য, নিজের কাজ করো; ডায়োজিনিসের এখন তোমার কিছুই নেই। আমার দাস পালিয়ে গেছে—না, আসলে আমি-ই মুক্ত হয়েছি।"

দাস-দাসীর সংসার মানেই পোশাক ও খাদ্যের প্রয়োজন; এতগুলো ক্ষুধার্ত পেটের দেখভাল, কাপড় কেনা, চুরি থেকে রক্ষা করা, এবং তাদের কান্না-অভিশাপের মধ্যেও কাজ আদায় করা।

কত বেশি সুখী সেই মানুষ, যে কারো কাছে ঋণী নয়—শুধু নিজের কাছে, যাকে সে সবচেয়ে সহজে প্রত্যাখ্যান করতে পারে!

কিন্তু যেহেতু আমাদের এমন দৃঢ়তা নেই, অন্তত আমাদের সম্পদ সীমিত করা উচিত—যাতে আমরা ভাগ্যের আঘাতে কম ক্ষতিগ্রস্ত হই।

যেমন, যোদ্ধাদের শরীর যুদ্ধের জন্য তখনই উপযুক্ত, যখন তা বর্মের ভেতরে সঠিকভাবে মানানসই থাকে; যদি তা অতিরিক্ত ফুলে ওঠে, তবে তা চারদিক থেকেই আঘাতের লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

ঠিক তেমনি, আদর্শ সম্পদের পরিমাণ হলো—যা দারিদ্র্যের সীমায় পড়ে না, আবার তার থেকে অনেক বেশি নয়।

এছাড়াও, আমরা এই সীমায় সন্তুষ্ট থাকতে পারব, যদি আগে থেকেই সংযমের অভ্যাস গড়ে তুলি; কারণ সংযম ছাড়া কোনো সম্পদই যথেষ্ট নয়, আর সংযম থাকলে সামান্যই যথেষ্ট হয়ে ওঠে।

বিশেষত, একটি প্রতিকার আমাদের হাতের কাছেই আছে—সংযমের চর্চার মাধ্যমে দারিদ্র্যকেও সম্পদে রূপান্তর করা যায়।

চল আমরা জাঁকজমক ত্যাগ করতে শিখি, এবং জিনিসকে তার কার্যকারিতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করি, প্রদর্শনের ভিত্তিতে নয়।

খাবার ক্ষুধা নিবারণ করুক, পানীয় তৃষ্ণা মেটাক; যৌনতা তার প্রয়োজন পূরণ করুক।

চল আমরা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর নির্ভর করতে শিখি, এবং পোশাক ও জীবনযাত্রাকে নতুন ফ্যাশনের পরিবর্তে পূর্বপুরুষদের রীতির সঙ্গে মানানসই করি।

চল আমরা আত্মসংযম বাড়াই, বিলাসিতা সংযত করি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করি, রাগ প্রশমিত করি, দারিদ্র্যকে পক্ষপাতহীনভাবে দেখি, এবং মিতব্যয়িতা অনুশীলন করি—যদিও অনেকেই এতে লজ্জা পায়।

প্রকৃতির প্রয়োজন মেটাতে সস্তা উপায় ব্যবহার করি, লাগামহীন আশা ও ভবিষ্যত-নির্ভর মনকে শৃঙ্খলিত করি, এবং সম্পদ অর্জনের লক্ষ্য রাখি নিজের ভেতর থেকে—ভাগ্যের ওপর নির্ভর না করে।

জীবনের নানাবিধ অন্যায় ও আকস্মিক বিপর্যয়কে পুরোপুরি ঠেকানো সম্ভব নয়; উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পাল তোলা নৌকায় ঝড়ের আঘাত আসবেই।

অতএব, আমাদের কার্যকলাপ সীমিত করতে হবে—যাতে ভাগ্যের অস্ত্র আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

এই কারণেই নির্বাসন বা বিপর্যয় কখনো কখনো আমাদের উপকারে আসে; ছোট ক্ষতি বড় ক্ষতিকে ঠেকিয়ে দেয়।

যখন মন উপদেশে সাড়া দেয় না এবং কোমল উপায়ে সংশোধিত হয় না, তখন কেন তাকে দারিদ্র্য, অপমান ও সর্বনাশের মতো কঠিন ওষুধ দিয়ে সুস্থ করা হবে না—এক দোষের প্রতিকারে আরেক দোষ?

সুতরাং চল আমরা অভ্যস্ত হই—অনেক মানুষের ভিড় ছাড়া আহার করতে, কম সংখ্যক দাসের ওপর নির্ভর করতে, পোশাককে তার প্রকৃত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে, এবং সীমিত পরিসরে বসবাস করতে।

শুধু দৌড় বা সার্কাসের প্রতিযোগিতায় নয়, আমাদের জীবনের এই দৌড়েও আমাদের ভেতরের পথ ধরে এগোতে হবে।

আমাদের অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও—যেখানে ব্যয় করা সবচেয়ে অর্থবহ—তার যথার্থতা নির্ভর করে সংযমের ওপর। অসংখ্য বই ও বিশাল গ্রন্থাগার রাখার অর্থ কী, যার শিরোনামগুলোই মালিক তার সারা জীবনেও পড়ে শেষ করতে পারবে না? বইয়ের স্তূপ ছাত্রকে জ্ঞান দেয় না, বরং ভারাক্রান্ত করে; বহু লেখকের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে অল্প কয়েকজন লেখকের প্রতি নিজেকে নিবেদিত করাই অনেক ভালো।

আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারে চল্লিশ হাজার বই পুড়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ এটিকে রাজকীয় ঐশ্বর্যের এক মহৎ স্মারক বলে প্রশংসা করতে পারে—যেমন টাইটাস লিভিয়াস একে রাজাদের রুচি ও অনুরাগের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলেছেন। কিন্তু সেটি প্রকৃত রুচি বা অনুরাগ ছিল না—বরং বিদ্যাচর্চার নামে আত্মতুষ্টি; প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাচর্চাও নয়, কারণ বইগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল জ্ঞানের জন্য নয়, প্রদর্শনের জন্য।

একইভাবে, তুমি দেখবে অনেক মানুষ, যাদের মৌলিক শিক্ষাও নেই, তারা বইকে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে নয়, বরং তাদের ভোজকক্ষের অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে। তাই আমাদের উচিত—ব্যবহারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বই কেনা, সাজসজ্জার জন্য নয়।

তুমি হয়তো বলবে, “এটি তো করিন্থীয় ব্রোঞ্জ বা চিত্রকর্মে অর্থ অপচয়ের চেয়ে সম্মানজনক ব্যয়।” কিন্তু যেকোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ততা নিন্দনীয়। কীভাবে তুমি এমন একজনকে সমর্থন

করবে, যে সাইট্রন কাঠ ও হাতির দাঁতের বইয়ের তাক সংগ্রহ করে, অজানা বা তৃতীয় শ্রেণির লেখকদের বই জমা করে, তারপর হাজার হাজার বইয়ের মাঝে বসে হাই তোলে, এবং তার বইগুলোর আসল বিষয়বস্তুর চেয়ে তাদের মলাট ও লেবেলেই বেশি আনন্দ পায়?

তুমি দেখবে, সবচেয়ে অলস মানুষদের কাছেই বক্তৃতা ও ইতিহাসের পূর্ণ সেট থাকে, আর তাদের বাক্সগুলো ছাদ পর্যন্ত স্তূপীকৃত। কারণ আজকাল একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগারও গরম-ঠান্ডা স্নানাগারের মতো বাড়ির অপরিহার্য অলংকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি অবশ্যই তাদের ক্ষমা করব, যারা অতিরিক্ত অধ্যয়নের প্রতি ভালোবাসার কারণে ভুল করে; কিন্তু এই সব মহান প্রতিভার রচনা ও তাদের প্রতিকৃতি—এসব সংগ্রহ করা হয় কেবল দেয়ালের আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জার জন্য।

কিন্তু হয়তো তুমি জীবনের এমন কোনো জটিল পরিস্থিতিতে পড়েছো, যেখানে জনজীবন বা ব্যক্তিগত জীবনের কোনো অবস্থা অজান্তেই তোমার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে—যা তুমি না খুলতে পারছো, না ছিঁড়ে ফেলতে পারছো।

তখন মনে রাখতে হবে—শিকলবন্দী বন্দিরা প্রথমে তাদের পায়ের শিকলের ভার অনুভব করে; কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, যখন তারা প্রতিরোধ না করে তা সহ্য করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন প্রয়োজন তাদের শেখায় দৃঢ়তার সঙ্গে সহ্য করতে, আর অভ্যাস শেখায় সহজে সহ্য করতে।

জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতেই তুমি আনন্দ, অবকাশ ও সুখ খুঁজে পাবে—যদি তুমি তোমার কষ্টকে হালকা করে নিতে প্রস্তুত থাকো এবং তা তোমাকে দুঃখিত হতে না দাও।

প্রকৃতি আমাদের কাছে আর কোনো বিষয়ে এত ঋণী করে রাখেনি—কারণ সে জানত আমরা কত দুঃখের জন্য জন্মেছি; তাই সে অভ্যাসের মাধ্যমে আমাদের দুর্ভাগ্যকে সহনীয় করে তুলেছে, এবং খুব দ্রুতই আমাদের সবচেয়ে কঠিন দুঃখেও অভ্যস্ত করে দেয়।

কেউ দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ সহ্য করতে পারত না, যদি তা প্রথম আঘাতের মতোই তীব্র থাকত।

আমরা সবাই ভাগ্যের সঙ্গে বাঁধা—কেউ ঢিলেঢালা সোনার শৃঙ্খলে, কেউ কঠিন নিম্নমানের ধাতুর শৃঙ্খলে; কিন্তু এতে কী আসে যায়? আমরা সবাই একই বন্দিত্বে আবদ্ধ।

কেউ উচ্চপদে আবদ্ধ, কেউ সম্পদে; কেউ উচ্চ বংশে, কেউ নিম্ন জন্মে; কেউ অন্যের শাসনে নত, কেউ নিজেরই শাসনে বন্দী; কেউ নির্বাসনে এক স্থানে আবদ্ধ, কেউ ধর্মীয় দায়িত্বে।

সমগ্র জীবনই এক প্রকার দাসত্ব।

অতএব তোমাকে তোমার পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে; যত কম সম্ভব অভিযোগ করতে হবে, এবং তার মধ্যে যে সুবিধাগুলো আছে তা গ্রহণ করতে হবে। এমন কোনো অবস্থা নেই, যা স্থির মনকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারে না।

ছোট জায়গাকেও দক্ষতায় ভাগ করে বহু কাজে ব্যবহারযোগ্য করা যায়; সঠিক বিন্যাস সংকীর্ণ স্থানকেও বাসযোগ্য করে তোলে।

চিন্তার মাধ্যমে সমস্যাকে অতিক্রম করো: কঠিন পরিস্থিতি কোমল করা যায়, সীমাবদ্ধতা প্রসারিত করা যায়, এবং ভারী বোঝা তাদের কাছে হালকা হয়, যারা তা বহন করতে জানে।

আর আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে দূরে দূরে পাঠানো উচিত নয়; বরং কাছের জিনিসের মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে—কারণ তা পুরোপুরি দমিয়ে রাখা যায় না।

অপ্রাপ্য বা কঠিন জিনিসগুলো ত্যাগ করে, সহজলভ্য জিনিসের পেছনে ছুটতে হবে—যেগুলো আমাদের আশাকে টানে; তবে বুঝতে হবে, এগুলো সবই তুচ্ছ—বাইরে ভিন্নরূপ হলেও ভেতরে একইভাবে শূন্য।

আমাদের চেয়ে উঁচুতে থাকা মানুষদের প্রতি ঈর্ষা করা উচিত নয়; কারণ যেগুলো উচ্চ শিখর মনে হয়, সেগুলো প্রায়ই বিপজ্জনক খাদ।

অন্যদিকে, যাদের ভাগ্য অন্যায়ভাবে সংকটপূর্ণ অবস্থায় ফেলেছে, তাদের জন্য নিরাপদ হলো—তাদের অহংকার কমিয়ে আনা, এবং নিজেদের অবস্থান যতটা সম্ভব বিনয়ী করে তোলা।

অনেকেই এমন উচ্চতায় অবস্থান করে, যেখান থেকে তারা নামতে পারে না—কারণ নামলেই পতন ঘটবে; কিন্তু তাদের স্বীকার করতে হবে, এটিই তাদের সবচেয়ে বড় বোঝা—তারা নিজেরাও অন্যদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

ন্যায়, কোমলতা, সদয়তা এবং উদারতার মাধ্যমে তারা নিজেদের জন্য ভবিষ্যৎ বিপদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে পারে।

কিন্তু এই মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তির সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো—অগ্রগতির একটি সীমা নির্ধারণ করা, এবং কখন থামতে হবে সেই সিদ্ধান্ত ভাগ্যের ওপর না ছেড়ে নিজেরাই আগে থেমে যাওয়া।

এভাবে আমাদের কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকবে, যা মনকে উদ্দীপিত করবে; কিন্তু তা সীমিত হওয়ায় আমাদের নিয়ন্ত্রণহীন অনিশ্চয়তায় ফেলবে না।

আমি যা বলছি তা সাধারণ, অপূর্ণ মানুষের জন্য—জ্ঞানীর জন্য নয়।

জ্ঞানী মানুষকে সতর্ক বা ভীতভাবে চলতে হয় না; তার নিজের ওপর এমন আস্থা যে সে ভাগ্যের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে এবং কখনোই পিছু হটে না।

সে ভাগ্যকে ভয় পায় না, কারণ সে মনে করে—তার সম্পদ, মর্যাদা, এমনকি শরীর, চোখ, হাত—এবং যা কিছু জীবনকে প্রিয় করে তোলে—সবই যেন সাময়িকভাবে ধার করা; এমনকি নিজের অস্তিত্বও।

সে এমনভাবে জীবনযাপন করে, যেন তাকে নিজেকেই ধার দেওয়া হয়েছে—এবং যখনই তা ফেরত দিতে বলা হবে, সে কোনো অভিযোগ ছাড়াই তা ফিরিয়ে দেবে।

তবে এতে সে নিজের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় না; বরং সে জানে, সে নিজেই নিজের মালিক নয়—তাই সে সবকিছুই যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে, যেমন একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার কাছে অর্পিত কোনো বস্তু রক্ষা করে।

আর যখন তাকে তার ঋণ শোধ করতে বলা হবে, তখন সে ভাগ্যকে দোষ দেবে না; বরং বলবে—
"আমি যা পেয়েছি তার জন্য কৃতজ্ঞ। আমি তোমার সম্পদ যত্নে রেখেছি এবং তা থেকে উপকৃত হয়েছি; এখন তোমার নির্দেশে আমি তা কৃতজ্ঞচিত্তে ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

"তুমি যদি চাও আমি কিছু রেখে দিই, আমি তা রক্ষা করব; যদি না চাও, তবে আমি আমার রৌপ্য, আমার গৃহ, আমার সংসার—সব তোমার কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

যদি প্রকৃতি আমাদের কাছে অর্পিত জীবন ফিরিয়ে নিতে চায়, আমরা বলব—
"আমি তোমার দেওয়া আত্মাকে আগের চেয়ে উন্নত অবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি দ্বিধা করছি না; তুমি যা দিয়েছিলে, তা আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

ফিরে যাওয়ায় ক্ষতি কী, যেখান থেকে আমরা এসেছি?

যে ভালোভাবে মরতে জানে না, সে ভালোভাবে বাঁচতেও পারে না।

অতএব, আমাদের প্রথমেই জীবনকে অতিমূল্যবান মনে করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে।

সিসেরোর ভাষায়, আমরা সেই গ্ল্যাডিয়েটরদের অপছন্দ করি, যারা যেকোনো উপায়ে জীবন রক্ষা করতে চায়; বরং আমরা তাদের প্রশংসা করি, যারা মৃত্যুকে অবজ্ঞা করতে পারে।

আমাদেরও তা উপলব্ধি করতে হবে—কারণ অনেক সময় মৃত্যুভয়ই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভাগ্য যেন আমাদের উদ্দেশে বলে—
"হে ভীতু ও নীচ প্রাণী, কেন তোমাকে রক্ষা করব? তুমি কেবল আরও আঘাত পাবে, কারণ তুমি সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে জানো না।"

"কিন্তু তুমি দীর্ঘজীবী হবে এবং সহজে মরবে—যদি তুমি নির্ভয়ে আঘাত গ্রহণ করো, গলা সরিয়ে না নাও।"

যে মৃত্যু ভয় পায়, সে কখনোই জীবনের উপযুক্ত কাজ করতে পারে না।

কিন্তু যে জানে, জন্মের মুহূর্তেই এই শর্ত নির্ধারিত হয়েছে, সে সেই নিয়মেই জীবনযাপন করবে, এবং এমন মানসিক শক্তি অর্জন করবে যাতে কোনো ঘটনাই তাকে বিস্মিত করতে না পারে।

কারণ, যা কিছু ঘটতে পারে তা আগেই অনুমান করলে, তার আঘাত অনেকটাই কমে যায়।

যারা প্রস্তুত থাকে, তাদের কাছে কিছুই অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু যারা সবকিছু ভালোই হবে বলে ভাবতে থাকে, তাদের ওপর বিপর্যয় হঠাৎ করেই আঘাত হানে।

রোগ, কারাবাস, বিপর্যয়, অগ্নিকাণ্ড—এসব কিছুই অপ্রত্যাশিত নয়।

আমি জানতাম, কী উন্মত্ত জনসমাজে প্রকৃতি আমাকে স্থাপন করেছে।

আমার আশেপাশে কতবার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে; কতবার মশাল হাতে অকাল মৃত্যুর শবযাত্রা আমার দরজার সামনে দিয়ে গেছে।

কতবার ভেঙে পড়া ভবনের শব্দ আমার পাশে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

যারা একসময় আমার সঙ্গে আদালতে, পরিষদে, এবং দৈনন্দিন কথোপকথনে যুক্ত ছিল—তাদের অনেকেই এক রাতের মধ্যেই চলে গেছে, সেই হাতগুলো বিচ্ছিন্ন করে, যা একসময় বন্ধুত্বে যুক্ত ছিল।

যে বিপদগুলো সবসময় আমার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, সেগুলো যদি কোনো একদিন সত্যিই আমার ওপর এসে পড়ে—তাতে কি আমার বিস্মিত হওয়া উচিত? অনেক মানুষই সমুদ্রযাত্রার পরিকল্পনা করে, কিন্তু ঝড়ের কথা একবারও ভাবে না।

একটি ভালো উক্তির জন্য আমি কখনোই কোনো নিম্নমানের লেখকের কাছেও যেতে লজ্জা পাব না। যখন পুবলিলিয়ুস তার মাইম নাটকের হাস্যকর দিকগুলো ছেড়ে জনতার মনোরঞ্জনের ভাষা থেকে সরে এসে গভীর চিন্তার প্রকাশ করতেন, তখন তার মধ্যে ট্র্যাজেডি ও কমেডির লেখকদের চেয়েও বেশি বুদ্ধিমত্তার শক্তি দেখা যেত। তিনি এমন অনেক চিন্তা প্রকাশ করেছেন, যা ট্র্যাজেডির চেয়েও গভীর—ফার্স তো দূরের কথা। যেমন তিনি বলেছেন:
"যা একজনের সঙ্গে ঘটতে পারে, তা সবার সঙ্গেই ঘটতে পারে।"

যদি তুমি এই ধারণাটিকে হৃদয়ের গভীরে স্থান দাও, এবং প্রতিদিন অন্যদের জীবনে যে অসংখ্য বিপর্যয় ঘটতে দেখো, সেগুলো তোমার কাছেও আসতে পারে—এভাবে ভাবো, তবে আঘাত আসার আগেই তুমি প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

বিপদ উপস্থিত হওয়ার পর নিজেকে প্রস্তুত করা অনেক দেরি হয়ে যায়।
"আমি ভাবিনি এমন হবে"—অথবা—"কে কখনো ভাবতে পারত এমন হবে?"—কেন ভাবনি?

কোন সম্পদ আছে, যার পিছু নেয় না দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও ভিক্ষাবৃত্তি?
কোন পদমর্যাদা আছে, যার বেগুনি পোশাক, পুরোহিতের দণ্ড, বা অভিজাতের জুতোর ফিতে—এসবের সঙ্গে যুক্ত নয় দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, অপমান ও ঘৃণার চিহ্ন?

কোন রাজত্ব আছে, যা ধ্বংস, পদদলিত হওয়া, স্বৈরশাসন ও মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হয় না?

এসবের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশি নয়—সিংহাসনে বসা থেকে অন্যের সামনে নতজানু হওয়ার মধ্যে মাত্র একটি ক্ষণিক সময়ের ব্যবধান।

অতএব জেনে রাখো—প্রত্যেক অবস্থাই পরিবর্তনশীল, এবং যা কারো সঙ্গে ঘটে, তা তোমার সঙ্গেও ঘটতে পারে।

তুমি ধনী—কিন্তু তুমি কি পম্পেয়ের চেয়েও ধনী? তবুও তাকেও একসময় রুটি ও পানির অভাবে পড়তে হয়েছিল, যখন তার আত্মীয় ও নতুন আতিথেয় গাইয়ুস তাকে সিজারের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল—যাতে সে নিজের বাড়ি বন্ধ করতে পারে।

যার নিজের ভূমিতে উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত অসংখ্য নদী প্রবাহিত হতো, তাকেই শেষ পর্যন্ত এক ফোঁটা পানির জন্য ভিক্ষা করতে হয়েছে। সে এক আত্মীয়ের প্রাসাদে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা যায়, আর সে যখন অনাহারে মরছিল, তার উত্তরাধিকারী তার জন্য রাজকীয় অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করছিল।

তুমি সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছো—কিন্তু সেজানুসের মতো উচ্চ, অপ্রত্যাশিত ও সর্বব্যাপী ক্ষমতা কি তোমার ছিল? তবুও একই দিনে সেনেট তাকে কারাগারে নিয়ে গেল এবং জনতা তাকে

টুকরো টুকরো করে ফেলল—এমনকি জল্লাদের টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

তুমি রাজা—আমি তোমাকে ক্রোসাসের উদাহরণ দেব না, যিনি নিজের চিতার আগুন জ্বলতে ও নিভতে দেখেছিলেন, নিজের রাজ্য ও মৃত্যুকেও অতিক্রম করে বেঁচে ছিলেন; কিংবা জুগুর্থার কথা বলব না, যিনি রোমানদের ভয় দেখানোর এক বছরের মধ্যেই তাদের সামনে প্রদর্শিত হন।

আমরা নিজেরাই দেখেছি—আফ্রিকার রাজা টলেমি এবং আর্মেনিয়ার রাজা মিথ্রিদাতেসকে গাইয়ুস বন্দী করেছিলেন। তাদের একজন নির্বাসিত হয়েছিলেন; অন্যজন আশায় ছিলেন যে অন্তত তাকে সৎভাবে নির্বাসনে পাঠানো হবে।

এই উলট-পালট ঘটনার ধারাবাহিকতায়, যদি তুমি যা কিছু ঘটতে পারে তাকে অনিবার্য বলে না মানো, তবে তুমি দুর্ভাগ্যকে এমন ক্ষমতা দাও, যা আগে থেকেই উপলব্ধি করলে সহজেই দমন করা যেত।

পরবর্তী বিষয় হলো—আমাদের শক্তি যেন অর্থহীনভাবে বা অর্থহীন কাজে নষ্ট না হয়। অর্থাৎ, যা আমরা অর্জন করতে পারি না তার জন্য আকাঙ্ক্ষা না করা, কিংবা যা অর্জনের পর বুঝি তা আসলে মূল্যহীন—এমন কিছুর পেছনে ছোটা নয়।

অন্য কথায়, আমাদের পরিশ্রম যেন বিফল না হয় এবং তার ফল যেন আমাদের পরিশ্রমের অযোগ্য না হয়; কারণ সাধারণত, ব্যর্থতা বা সফলতার লজ্জা—উভয় ক্ষেত্রেই তিক্ততা আসে।

আমাদের এই দৌড়ঝাঁপ কমাতে হবে—যাতে অনেক মানুষ লিপ্ত থাকে: তারা বাড়ি, থিয়েটার, সভাস্থল—সবখানে ঘোরে, অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করে, সবসময় ব্যস্ততার ভান করে।

তুমি যদি তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করো—"কোথায় যাচ্ছো?"—সে বলবে, "জানি না; কারো সঙ্গে দেখা করব, কিছু একটা করব।"

তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়—যা তারা করতে চেয়েছিল তা নয়, বরং যা সামনে আসে তাই করে।

তাদের এই ঘোরাফেরা পিঁপড়ার মতো—যারা গাছের ডালে ওঠে-নামে, কিন্তু কোনো লক্ষ্য ছাড়াই।

অনেক মানুষের জীবন এমনই—যাকে তুমি ন্যায়সঙ্গতভাবেই "ব্যস্ত অলসতা" বলতে পারো।

তুমি কিছু মানুষকে দেখে করুণা অনুভব করবে—যারা এমনভাবে ছুটে চলে যেন কোথাও আগুন লেগেছে; তারা বারবার অন্যদের সঙ্গে ধাক্কা খায়, নিজেদের ও অন্যদের ফেলে দেয়—কিন্তু আসলে তারা এমন কারো কাছে যাচ্ছে, যে তাদের ফিরতি সাক্ষাৎও দেবে না; অথবা এমন কারো অন্ত্যেষ্টিতে যাচ্ছে, যাকে তারা চেনে না; অথবা এমন কোনো মামলার শুনানিতে, যা বারবার চলছে; অথবা এমন এক নারীর বাগদানে, যে বারবার বিয়ে করে।

এমনকি কখনো কখনো তারা শবযাত্রায় অংশ নিতে গিয়ে নিজেই মৃতদেহ বহন করে।

তারপর তারা ঘরে ফিরে—অকারণে ক্লান্ত হয়ে—এবং স্বীকার করে যে তারা জানেই না কেন বেরিয়েছিল বা কোথায় গিয়েছিল। আর পরের দিন আবার একইভাবে বেরিয়ে পড়ে।

অতএব, তোমার প্রতিটি কাজের একটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত—একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য।

মানুষকে অস্থির করে তোলে পরিশ্রম নয়, বরং জিনিসের ভুল ধারণা।

পাগলেরাও কিছু আশার দ্বারা প্রভাবিত হয়—কোনো কিছুর বাহ্যিক রূপ তাদের উত্তেজিত করে, কারণ তাদের বিভ্রান্ত মন তার শূন্যতা বুঝতে পারে না।

একইভাবে, যারা ভিড় বাড়াতে ঘর থেকে বের হয়, তাদের প্রত্যেককে ফাঁপা ও তুচ্ছ কারণ শহরের চারদিকে ঘোরায়।

ভোর তাদের বের করে আনে—কোনো কাজ ছাড়াই; তারা অনেকের দরজায় ধাক্কা খায়, দাসদের দ্বারা অভ্যর্থনা পায়, অনেকের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়—এবং শেষে দেখে, নিজের মতোই কাউকে পাওয়া আরও কঠিন।

এই দোষ থেকে জন্ম নেয় আরও নিকৃষ্ট অভ্যাস—অন্যের কথা শোনা, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অনুসন্ধান করা, এবং এমন অনেক কিছু জানা—যা বলা বা শোনা কোনোটাই নিরাপদ নয়।

আমি মনে করি, ডেমোক্রিটাস এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন:
"যে শান্ত জীবনযাপন করতে চায়, তাকে ব্যক্তিগত বা জনজীবনে অতিরিক্ত কাজে জড়ানো উচিত নয়"—অবশ্যই, অর্থহীন কাজ বোঝানো হয়েছে।

কারণ যদি কাজগুলো সত্যিই প্রয়োজনীয় হয়, তবে ব্যক্তিগত ও জনজীবনে অসংখ্য কাজ করতেই হবে। কিন্তু যখন কোনো বাধ্যতামূলক কর্তব্য আমাদের ডাকে না, তখন আমাদের কার্যকলাপ সীমিত করা উচিত।

যে মানুষ অনেক কাজে নিজেকে জড়ায়, সে প্রায়ই নিজেকে ভাগ্যের হাতে তুলে দেয়; কিন্তু সবচেয়ে নিরাপদ নীতি হলো—ভাগ্যকে খুব কমই পরীক্ষা করা, যদিও তাকে সবসময় মনে রাখা এবং তার ওপর কোনো কিছুতেই ভরসা না করা।

যেমন বলা যায়:
"আমি সমুদ্রযাত্রা করব—যদি কিছু না ঘটে।"
"আমি প্রেটর হব—যদি কিছু বাধা না দেয়।"
"আমার কাজ সফল হবে—যদি কিছু ব্যাঘাত না ঘটে।"

এই কারণেই আমরা বলি—জ্ঞানীর কাছে কিছুই অপ্রত্যাশিত নয়।

আমরা তাকে মানবজীবনের ঘটনাগুলো থেকে সরিয়ে দিই না, বরং ভুল ধারণা থেকে মুক্ত করি।

তার জীবনে সবকিছু তার ইচ্ছামতো ঘটে না—বরং তার হিসাবমতো ঘটে; আর সে সর্বাগ্রে ধরে নেয়, তার পরিকল্পনায় বাধা আসতে পারে।

অতএব, যখন মন নিশ্চিত সাফল্যের প্রতিশ্রুতি পায় না, তখন ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার দুঃখও অনেক সহজে সহ্য করতে পারে।

আমাদের নিজেদের এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে আমরা আমাদের স্থির পরিকল্পনার ওপর অতিরিক্ত নির্ভর না করি এবং ভাগ্য আমাদের যেদিকে নিয়ে যায়, সেদিকে সহজে সরে যেতে পারি—উদ্দেশ্য বা অবস্থার পরিবর্তনকে ভয় না করে; তবে সেই চঞ্চলতা যেন আমাদের গ্রাস না করে, যা মানসিক প্রশান্তির সবচেয়ে বড় শত্রু।

কারণ একদিকে আছে একগুঁয়েমি—যেখান থেকে ভাগ্য প্রায়ই জোর করে কিছু ছিনিয়ে নেয়, আর তা এনে দেয় দুঃখ ও উৎকণ্ঠা; আর অন্যদিকে আছে লাগামহীন চঞ্চলতা—যা কোথাও নিজেকে সংযত করতে পারে না। এই দুটোই প্রশান্তির বিরোধী—একদিকে পরিবর্তনকে অসম্ভব করে তোলে, অন্যদিকে সহ্য করাকেও।

সুতরাং মনকে বাইরের বিষয় থেকে ফিরিয়ে এনে নিজের ভেতরে স্থাপন করতে হবে। তাকে নিজের ওপর আস্থা রাখতে হবে, নিজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে নিতে হবে, নিজের সম্পদকেই মূল্য দিতে হবে। যতটা সম্ভব অন্যের বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নিজের দিকে মনোযোগ দিতে হবে; ক্ষতিকে যেন ক্ষতি মনে না করে, এমনকি দুর্ভাগ্যকেও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

একবার জাহাজডুবির সংবাদ পেয়ে এবং নিজের সমস্ত সম্পদ ডুবে গেছে শুনে আমাদের গুরু জেনো বলেছিলেন,
"ভাগ্য আমাকে কম বোঝা নিয়ে দার্শনিক হতে বলছে।"

এক স্বৈরশাসক যখন দার্শনিক থিওডোরাসকে হত্যা করার হুমকি দেয় এবং এমনকি তাকে কবর না দেওয়ার কথাও বলে, তখন তিনি উত্তর দেন—
"তুমি যা খুশি করতে পারো; আমার অর্ধ-পাত্র রক্ত তোমার হাতে। কিন্তু কবর দেওয়ার ব্যাপারে তুমি নির্বোধ—আমি মাটির উপরে পচি বা নিচে, তাতে আমার কী আসে যায়?"

জুলিয়াস কানুস—এক অসাধারণ মহান ব্যক্তি—যিনি আমাদের যুগে জন্মেছিলেন বলেই আমরা তাকে আরও বেশি সম্মান করতে পারি, গাইয়ুসের সঙ্গে দীর্ঘ বিতর্ক করেছিলেন। যখন তিনি বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন গাইয়ুস তাকে বলল,
"যদি তুমি কোনো নির্বোধ আশা পোষণ করে থাকো, তবে জেনে রাখো—আমি তোমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছি।"

তিনি উত্তর দিলেন,
"ধন্যবাদ, মহামান্য সম্রাট।"

তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। হয়তো তিনি ব্যঙ্গ করছিলেন—এমন নিষ্ঠুরতার ইঙ্গিত দিয়ে, যেখানে মৃত্যু নিজেই আশীর্বাদ হয়ে ওঠে। হয়তো তিনি সম্রাটের

উন্মাদ আচরণকে বিদ্রূপ করছিলেন—কারণ লোকেরা তো তাকে ধন্যবাদই দিত, যখন সে তাদের সন্তানদের হত্যা করত বা সম্পত্তি কেড়ে নিত! অথবা হয়তো তিনি মৃত্যুকে মুক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, এটি ছিল এক সাহসী উত্তর।

কেউ বলতে পারে—“এরপর গাইয়ুস তাকে বাঁচিয়েও রাখতে পারত।” কিন্তু কানুস সে ভয় করেননি; কারণ গাইয়ুস এ ধরনের আদেশে নিজের কথা রাখার জন্য পরিচিত ছিল।

তুমি কি বিশ্বাস করবে—মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে দশটি দিন তিনি একটুও উদ্বিগ্ন হননি? অবিশ্বাস্য তার আচরণ, তার কথা, তার প্রশান্তি।

যখন একদল মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি খেলার বোর্ডে বসে খেলা খেলছিলেন। একজন সেন্টুরিয়ন তাকে ডাকলে তিনি নিজের গুটিগুলো গুনে নিয়ে সঙ্গীকে বললেন,
“দেখো, আমি মারা যাওয়ার পর যেন তুমি মিথ্যে করে জয় দাবি না করো।”

তারপর সেন্টুরিয়নের দিকে মাথা নেড়ে বললেন,
“তুমি সাক্ষী থাকো—আমি এক গুটি এগিয়ে আছি।”

তুমি কি ভাবো তিনি শুধু খেলায় মগ্ন ছিলেন? না—তিনি নিজের ব্যঙ্গরস উপভোগ করছিলেন।

তার বন্ধুরা তার মৃত্যুতে শোক করছিল। তিনি তাদের বললেন,
“তোমরা দুঃখিত কেন? তোমরা জানতে চাও আত্মা অমর কি না—আমি তো শিগগিরই জেনে যাব।”

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সত্য অনুসন্ধান থামাননি; নিজের মৃত্যুকেই আলোচনার বিষয় বানিয়েছিলেন।

তার দর্শনের শিক্ষক তার সঙ্গে যাচ্ছিলেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার স্থান থেকে কিছু দূরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,
“কানুস, এখন তুমি কী ভাবছ? তোমার মানসিক অবস্থা কেমন?”

কানুস উত্তর দিলেন,
“আমি লক্ষ্য করতে চাই—সেই ক্ষণিক মুহূর্তে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকে কি না।”

এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন—যদি কিছু জানতে পারেন, তবে বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে আত্মার অবস্থা জানাবেন।

দেখো—ঝড়ের মধ্যেও কী অপূর্ব প্রশান্তি! এমন এক আত্মা, যা অমরত্বের যোগ্য—নিজের ভাগ্যকে আহ্বান করে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য; জীবনের শেষ মুহূর্তেও জ্ঞান অনুসন্ধান চালিয়ে যায়, এমনকি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থেকেও কিছু শিখতে চায়।

কেউ কখনো এত দীর্ঘ সময় ধরে দর্শন চর্চা করেনি। এমন একজন মহান ব্যক্তিকে সহজে বিস্মৃত করা যায় না; তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। হে গৌরবময় আত্মা, তুমি গাইয়ুসের শিকারদের তালিকাকে মহিমান্বিত করেছ—আমরা তোমার অমরত্ব নিশ্চিত করব।

তবে ব্যক্তিগত দুঃখের কারণ দূর করলেও লাভ নেই—কারণ কখনো কখনো আমরা মানবজাতির প্রতিই বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ি।

যখন তুমি দেখো—সরলতা কত বিরল, নিষ্কলুষতা প্রায় অজানা; বিশ্বস্ততা কেবল সুবিধার সময়েই পাওয়া যায়; সফল অপরাধের সংখ্যা অসংখ্য; কামনা-বাসনার মাধ্যমে মানুষ যা অর্জন করে ও হারায়—সবই সমানভাবে নিকৃষ্ট; আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখন আর কোনো সীমা মানে না, বরং দুষ্কর্ম থেকেই তার জৌলুস পায়—তখন মন এমন এক অন্ধকারে ডুবে যায়, যেখানে মনে হয় যেন সব গুণাবলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যেগুলো না পাওয়ার আশা করা যায়, না অর্জন করে কোনো লাভ আছে।

তাই আমাদের নিজেদের প্রশিক্ষিত করতে হবে—এই সাধারণ দোষগুলোকে ঘৃণার নয়, হাস্যরসের বিষয় হিসেবে দেখতে।

আমাদের উচিত Democritus-এর অনুকরণ করা, Heraclitus-এর নয়। কারণ জনসমক্ষে বের হলে হেরাক্লিটাস কাঁদতেন, আর ডেমোক্রিটাস হাসতেন। একজন মানুষের কর্মকাণ্ডকে দুঃখজনক মনে করতেন, আর অন্যজন তা মনে করতেন হাস্যকর।

অতএব, আমাদের উচিত সবকিছুকে হালকাভাবে নেওয়া এবং সহনশীলতার সঙ্গে সহ্য করা। জীবনকে নিয়ে হাসা—এটি জীবনকে নিয়ে বিলাপ করার চেয়ে অনেক বেশি সভ্য আচরণ।

মনে রেখো—যে মানুষ মানবজাতিকে নিয়ে হাসে, সে তার জন্য বেশি মঙ্গল কামনা করে, সেই মানুষের তুলনায় যে কেবল শোক করে; কারণ হাস্যরত ব্যক্তি এখনও আশার সম্ভাবনা রাখে, আর শোককারী ব্যক্তি এমন কিছুর জন্য বিলাপ করে যা সে সংশোধনের আশা করে না।

সব দিক থেকে বিবেচনা করলে, হাসিকে সংযত না করা—কান্নাকে সংযত না করার চেয়েও উচ্চ মানসিকতার লক্ষণ। কারণ হাসি আমাদের কোমল অনুভূতির প্রকাশ; এটি মনে করে—আমাদের জীবনের বাহ্যিক সাজসজ্জার মধ্যে কোনো কিছুই এত গুরুতর, এত গুরুত্বপূর্ণ, বা এত দুঃখজনক নয়।

প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের আনন্দ ও দুঃখের কারণগুলো বিশ্লেষণ করে, তবে সে বায়নের সেই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করবে—মানুষের সব কর্মকাণ্ড তার জন্মের মতোই তুচ্ছ; তার জীবন তার সৃষ্টির চেয়ে বেশি মহান নয়; শূন্য থেকে জন্ম নিয়ে সে আবার শূন্যেই ফিরে যায়।

তবুও, মানুষের আচরণ ও ত্রুটিগুলোকে শান্তভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়—না অতিরিক্ত হাসিতে ভেঙে পড়া, না অতিরিক্ত কান্নায়।

কারণ অন্যের দুঃখে নিজেকে কষ্ট দেওয়া মানে চিরস্থায়ী দুঃখে থাকা, আর তাতে আনন্দ পাওয়া নিষ্ঠুরতা।

যেমন, কারো সন্তান মারা গেলে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে কাঁদা—এটি আসলে শূন্য সহানুভূতির প্রকাশ।

নিজের দুঃখেও আমাদের উচিত প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী শোক করা—সমাজের নিয়ম মেনে নয়। অনেক মানুষ কাঁদে শুধু দেখানোর জন্য; কেউ না দেখলে তাদের চোখ শুকনোই থাকে—কারণ তারা মনে করে, অন্যরা কাঁদছে, তাই তাদেরও কাঁদা উচিত।

অন্যদের অনুসরণ করার এই প্রবণতা এত গভীরে গেঁথে গেছে যে, আমাদের সবচেয়ে স্বাভাবিক অনুভূতিও—শোক—একটি অভিনয়ে পরিণত হয়েছে।

এরপর আমাদের এমন এক শ্রেণির ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, যা যথার্থ কারণেই আমাদের মধ্যে দুঃখ ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

যখন সৎ মানুষদের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে—যখন Socrates-কে কারাগারে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করা হয়, Rutilius Rufus-কে নির্বাসনে জীবন কাটাতে হয়, Pompey ও Cicero-কে তাদেরই অনুগামীদের সামনে গলায় ছুরি দিতে হয়, আর Cato the Younger—যিনি জীবন্ত গুণের প্রতীক—নিজেই নিজের তরবারিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, যাতে বিশ্ব বুঝতে পারে তার নিজের এবং রাষ্ট্রের কী অবস্থা হয়েছে—তখন আমাদের স্বাভাবিকভাবেই যন্ত্রণা অনুভব করতে হয় যে ভাগ্য এমন অন্যায় পুরস্কার দেয়।

তখন আমাদের প্রত্যেকের মনে প্রশ্ন জাগে—যখন শ্রেষ্ঠ মানুষরাই সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয়, তখন আমরা নিজেদের জন্য কী আশা করতে পারি?

এরপর কী করা উচিত? দেখো, এই প্রত্যেক মানুষ কীভাবে তাদের ভাগ্যকে গ্রহণ করেছে। যদি তারা সাহসিকতার সঙ্গে তা সহ্য করে থাকে, তবে তোমার মনেও তেমন সাহসের আকাঙ্ক্ষা জাগুক। আর যদি তারা ভীরুতার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে থাকে, তবে তাদের মধ্যে কিছুই প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান ছিল না।

অতএব, তারা হয় তাদের সাহসের জন্য তোমার প্রশংসার যোগ্য, নয়তো তাদের ভীরুতার জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষার অযোগ্য। কারণ এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কী হতে পারে—যদি মহান মানুষরা সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে অন্যদের ভীত করে তোলে?

আমাদের উচিত বারবার সেই ব্যক্তিকে প্রশংসা করা, যে প্রশংসার যোগ্য, এবং বলা—
"যত বেশি সাহসী, তত বেশি সুখী! তুমি সব বিপদ, হিংসা ও রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছ; তুমি কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছ—এমন নয় যে দেবতারা তোমাকে দুর্ভাগ্যের যোগ্য মনে করেছিলেন, বরং তুমি এমন যে ভাগ্যের আর তোমার ওপর কোনো ক্ষমতাই থাকা উচিত নয়।"

কিন্তু যারা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গিয়েও পিছিয়ে যায় এবং জীবনের দিকে ফিরে তাকায়—তাদের আমরা যেন দৃঢ়ভাবে ধরে রাখি।

আমি কারো জন্যই কাঁদব না—না সেই ব্যক্তির জন্য, যে সুখী, না তার জন্য, যে নিজেই কাঁদছে। কারণ প্রথমজন নিজেই আমার চোখের জল মুছে দিয়েছে; আর দ্বিতীয়জন তার নিজের কান্নার মাধ্যমেই প্রমাণ করেছে যে সে করুণার যোগ্য নয়।

আমি কি Hercules-এর জন্য কাঁদব, কারণ তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল?
অথবা Marcus Atilius Regulus-এর জন্য, যাকে অসংখ্য পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছিল?
অথবা Cato the Younger-এর জন্য, যিনি নিজেই নিজের ক্ষতকে আরও গভীর করেছিলেন?

তারা সবাই অল্প সময়ের জীবন ত্যাগ করে অনন্ত জীবনের পথে পৌঁছেছিল; মৃত্যুর মাধ্যমেই তারা অমরত্ব অর্জন করেছিল।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের উৎস আছে—যদি তুমি নিজের প্রকৃত সত্তা গোপন করে, কৃত্রিম ভঙ্গি ধারণ করে বাঁচতে চাও, এবং কাউকে নিজের আসল রূপ দেখাতে না চাও—যেমন অনেকেই করে, যাদের জীবন ভান ও বাহ্যিক প্রদর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে।

কারণ সবসময় নিজের ওপর নজর রাখা—এই ভয়ে যে, তোমার মুখোশ খুলে পড়তে পারে—এ এক অসহ্য যন্ত্রণা।

যখনই আমরা মনে করি, কেউ আমাদের দেখছে এবং বিচার করছে, তখন আমরা কখনোই নির্ভার হতে পারি না। কারণ অনেক ঘটনাই ঘটে, যা আমাদের অজান্তেই আমাদের ভান উন্মোচিত করে ফেলে।

আর যদি কোনোভাবে এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সফলও হয়, তবুও যারা সারাজীবন মুখোশ পরে থাকে, তাদের জীবন কখনোই স্বস্তিদায়ক বা উদ্বেগমুক্ত হয় না।

বরং কত আনন্দময় সেই সৎ, সরল ও স্বাভাবিক জীবন—যা নিজের প্রকৃতি কোনোভাবেই আড়াল করে না!

যদিও এই জীবনেও একটি ঝুঁকি আছে—সবকিছু যদি সবার কাছে প্রকাশ করা হয়, তবে কেউ কেউ তা অবজ্ঞা করতে পারে; কারণ কিছু মানুষের কাছে অতিরিক্ত পরিচিতি অবজ্ঞা জন্মায়।

তবে গুণ কখনোই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তুচ্ছ হয়ে যায় না। আর চিরস্থায়ী ভানের যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে সরলতার জন্য অবজ্ঞিত হওয়াই শ্রেয়।

তবুও, এখানে সংযম জরুরি—কারণ সরলভাবে বাঁচা আর অসতর্কভাবে বাঁচার মধ্যে বড় পার্থক্য আছে।

আমাদের উচিত প্রায়ই নিজের মধ্যে ফিরে আসা; কারণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা আমাদের শান্ত স্বভাবকে ব্যাহত করে, আবেগকে আবার জাগিয়ে তোলে এবং যে মানসিক দুর্বলতা পুরোপুরি সেরে ওঠেনি, তাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

তবে এই দুই অবস্থার সমন্বয় প্রয়োজন—নিঃসঙ্গতা ও জনসমাগম।

একটি আমাদের মানুষকে আকাঙ্ক্ষা করতে শেখায়, অন্যটি নিজের সান্নিধ্যকে; এবং এরা একে অপরের প্রতিকার হিসেবে কাজ করে।

নিঃসঙ্গতা আমাদের ভিড়ের প্রতি বিতৃষ্ণা দূর করে, আর ভিড় আমাদের নিঃসঙ্গতার একঘেয়েমি কাটায়।

মনকে সবসময় একই মাত্রার একাগ্রতায় ধরে রাখা উচিত নয়; তাকে মাঝে মাঝে হালকা ও আনন্দদায়ক বিনোদনের সুযোগ দিতে হবে।

Socrates ছোট শিশুদের সঙ্গে খেলতে লজ্জা পাননি; Cato the Younger রাষ্ট্রকার্যের ক্লান্তি দূর করতে মদের আশ্রয় নিয়েছিলেন; আর Scipio Africanus—যার জীবন ছিল বিজয় ও সামরিক গৌরবের প্রতীক—তিনি নৃত্যের মাধ্যমে নিজেকে হালকা করতেন। তবে তা আজকের মতো নরম-নাজুক ভঙ্গিতে নয়, যেখানে হাঁটার মধ্যেও অতিরিক্ত কোমলতা ও ভঙ্গিমা দেখা যায়; বরং প্রাচীন, দৃঢ় ও পুরুষোচিত ভঙ্গিতে—যেভাবে উৎসব ও খেলাধুলার সময় মানুষ নাচত, এমনকি শত্রুর চোখেও মর্যাদা হারাত না।

আমাদের মনকেও বিশ্রাম নিতে দিতে হবে; বিশ্রামের পর তা আরও সতেজ ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। যেমন উর্বর জমিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চাষ করলে তা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তেমনি নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম আমাদের মানসিক শক্তিকে ক্ষয় করে ফেলে। কিন্তু অল্প বিশ্রাম ও আরাম সেই শক্তিকে আবার ফিরিয়ে আনে।

অবিরাম পরিশ্রম মনকে এক ধরনের জড়তা ও ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন করে। মানুষ খেলাধুলা ও বিনোদনের দিকে আকৃষ্ট হয়, কারণ এতে স্বাভাবিক এক ধরনের আনন্দ আছে; তবে অতিরিক্ত আসক্তি আমাদের মন থেকে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা কেড়ে নেয়।

ঘুমও আমাদের পুনরুদ্ধারের জন্য অপরিহার্য; কিন্তু দিনরাত অতিরিক্ত ঘুমালে তা মৃত্যুর সমান হয়ে ওঠে।

কোনো কিছু থেকে সাময়িকভাবে শিথিল হওয়া আর পুরোপুরি ছিন্ন করা—এই দুইয়ের মধ্যে বড় পার্থক্য আছে।

আইনপ্রণেতারা উৎসব ও ছুটির দিন নির্ধারণ করেছিলেন, যাতে মানুষ আনন্দ উপভোগ করতে পারে—কারণ তারা বুঝেছিলেন, শ্রমের মধ্যে একটি ভারসাম্য আনা প্রয়োজন।

যেমন বলেছি, কিছু মহান ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিত বিশ্রাম নিতেন; আবার কেউ কেউ প্রতিদিনের কাজকে অবসর ও পরিশ্রমের মধ্যে ভাগ করে নিতেন।

আমি মনে করি, মহান বক্তা Asinius Pollio-এর অভ্যাস ছিল—দশম ঘণ্টার পর তিনি আর কাজ করতেন না। এমনকি তিনি চিঠিও পড়তেন না, যাতে নতুন কোনো কাজ এসে তাকে ব্যস্ত না করে। ওই দুই ঘণ্টায় তিনি সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতেন।

কেউ কেউ দিনের মাঝখানে বিশ্রাম নেয় এবং বিকেলের জন্য হালকা কাজ রেখে দেয়।

আমাদের পূর্বপুরুষরাও সেনেটে দশম ঘণ্টার পর নতুন কোনো আলোচনা শুরু করতে নিষেধ করেছিলেন। সেনাবাহিনীতেও প্রহর ভাগ করে দেওয়া হয়; এবং যারা অভিযানে থেকে ফিরে আসে, তারা রাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়।

আমাদের মনকেও তেমনই সময়ে সময়ে অবসর দিতে হবে—এটাই তার খাদ্য ও শক্তি।

আমাদের বাইরে হাঁটতে যেতে হবে, যাতে নির্মল আকাশ ও বিশুদ্ধ বাতাস মনকে সতেজ ও শক্তিশালী করে তোলে।

কখনো কখনো গাড়িতে ভ্রমণ, দৃশ্যপট পরিবর্তন, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা বা কিছুটা মুক্তভাবে পানাহার থেকেও মন নতুন শক্তি পায়।

মাঝে মাঝে এমন পর্যায়েও যাওয়া যায়, যেখানে হালকা মত্ততা আসে—কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ডুবে যাওয়া নয়। কারণ এটি দুশ্চিন্তা ধুয়ে দেয়, মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং দুঃখ দূর করে—যেমন কিছু রোগও এতে সেরে যায়।

'লিবার' নামটি কেবল জিহ্বা শিথিল করার জন্য নয়, বরং মনকে দুশ্চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য; এটি মনকে মুক্ত করে, শক্তি জোগায় এবং সাহসী করে তোলে।

তবে মদের ক্ষেত্রেও, স্বাধীনতার মতোই, সংযম অপরিহার্য।

Solon এবং Arcesilaus-কে মদপ্রিয় বলা হয়, আর Cato the Younger-কেও কখনো কখনো মদ্যপ বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে; কিন্তু যে তাকে অভিযুক্ত করে, সে বরং এই অভিযোগকে সম্মানজনক করে তোলে—কাটোকে অপমানিত করতে পারে না।

তবে এ অভ্যাস ঘন ঘন করা উচিত নয়, যাতে মন এতে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে। তবুও মাঝে মাঝে তাকে মুক্তভাবে আনন্দ করতে দিতে হবে—কঠোর সংযম থেকে কিছুক্ষণের জন্য অবকাশ দিতে হবে।

কারণ, আমরা যদি গ্রিক কবির কথায় বিশ্বাস করি—"কখনো কখনো উন্মাদ হওয়াও মধুর"; অথবা প্লেটোর মতে—"যে মানুষ সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কের, সে কবিতার দরজায় বৃথাই কড়া নাড়ে"; কিংবা এরিস্টটলের মতে—"মহান বুদ্ধির মধ্যে সামান্য উন্মাদনার ছোঁয়া না থাকলে তা সত্যিকার মহান হয় না"—তবে বুঝতে পারি, গভীরভাবে আলোড়িত মনই কেবল মহান কিছু সৃষ্টি করতে পারে।

যখন মন দৈনন্দিন চিন্তাকে অতিক্রম করে, দৈব অনুপ্রেরণার ডানায় ভর করে উঁচুতে ওঠে, তখনই সে এমন সুর তোলে যা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে।

যতক্ষণ সে পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ সে উচ্চ ও কঠিন শিখরে পৌঁছাতে পারে না; তাকে সাধারণ পথ ছেড়ে দ্রুতগতিতে এগোতে হয়—নিজের ভয়কে অতিক্রম করে।

অতএব, প্রিয় সেরেনুস, তোমার মানসিক প্রশান্তি রক্ষা করার উপায়, তা পুনরুদ্ধারের উপায় এবং অজান্তে তোমার মধ্যে প্রবেশ করা ত্রুটিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উপায়—এসবই এখানে বলা হলো।

কিন্তু মনে রেখো—এই সব উপায়ের কোনোটিই যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, যদি তুমি এই ভঙ্গুর জিনিসটিকে (প্রশান্তিকে) রক্ষা করতে চাও, আর তোমার চঞ্চল মনকে সতর্ক ও অবিরাম যত্ন দিয়ে ঘিরে না রাখো।